আচার্য
জগদীশচন্দ্র
ও
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

শ্রী অবনীনাথ মিত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র
ও
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

শ্রীঅবনীনাথ মিত্র

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

মূল্য : ১.৫০

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

মানুষমাত্রেরই জীবনের দুইটি দিক থাকে। একটি তাহার নিভৃত জীবন, যাহার পূর্ণ পরিচয় পান শুধু অন্তর্যামী, এবং আংশিক ভাবে—কম-বেশী পায় তাহার জীবনপথের নিত্য সাথী, সঙ্গী ও সহকর্মীগণ। অন্যদিকে থাকে তাহার জীবনের বাহিরের রূপ, যাহা প্রকাশ পায় তাহার দৈনন্দিন কাজকর্ম্মে, ব্যক্ত চিন্তাধারায় এবং তাহার চিন্তা ও কাজের ফলাফলে। সাধারণ জনের ক্ষেত্রে এই দুই দিকের মধ্যে যে প্রভেদ সেটা খুব বেশী কিছু নয়; যে অল্প লইয়াই থাকে তাহার জীবনের গণ্ডী এত অল্প পরিসরের যে, তাহার প্রায় সব কিছুই অন্যের দৃষ্টিতে সহজেই ধরা দেয়। যাহা দেখা যায় না, তাহার কৈফিয়ৎ-হিসাব জানিতে চাহেন শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা।

কিন্তু মহাজন মহামানবের জীবনে এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি বিশাল, অতি গভীর। বিশেষতঃ যেখানে সেই জীবনের বহির্জাগতিক প্রকাশ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, সেখানে তাহার নিভৃত ও একান্ত জীবনের দিক যেন আরও গোপন ও অন্ধকার-আবৃত। তাহার কর্ম্ম ও চিন্তার উৎস যেখানে, সেখানে পৌঁছায় তাহাদেরই দৃষ্টি, যাহাদের নিজস্ব জীবন ঐ মহামানবের জীবনের সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি ও আনুগত্যের যোগসূত্রে দৃঢ়ভাবে বাঁধা, যাহারা তাঁহার সহায়ক বা সহকর্ম্মীরূপে তাঁহার স্বীকৃতি পাইয়াছে। এমন কি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগেরও জীবনক্ষেত্রে সেই অন্তরের প্রেরণা ও চেতনার পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশিত হয় শুধু তাঁহাদেরই কাছে, যাঁহারা প্রিয় শিষ্যরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন সেই মহাপুরুষের নিকট। মহামানবের কর্ম্মজীবনে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও তাহার প্রতি-ক্রিয়ার বিবরণ সাধারণ জনের নিকট জ্ঞাতব্য বস্তু, কেন না উহা জাতীয় ও সামাজিক জীবনে আশা ও উদ্দীপনার আধার।



বসু বিজ্ঞানমন্দির ও আচার্যভবনের বহির্দৃশ্য

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের বহিঃপ্রকাশ সমুজ্জ্বল ও সুবিশাল। তাঁহার মনীষার জ্যোতি বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রকে আলোকিত করিয়াছে, যাহা তাঁহার সূক্ষ্মবিচার-দৃষ্টি কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বে অন্ধকারে আবৃত ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার আবিষ্কার ও অবদান এখন জগদ্বিখ্যাত। সে বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার বা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার চিন্তা ও প্রয়াস এতটা ফলপ্রসূ হইল কিরূপে, তাহার পূর্ণ বিবরণ—এমন কি, আংশিকভাবেও সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। বিধাতার কৃপায় তিনি অসাধারণ বুদ্ধি-বিচার ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কূট সমস্যাপূরণের আশ্চর্য্য ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে তিনি জীবনে সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্ম্মীও পাইয়াছিলেন যথেষ্ট, যাহা না পাইলে এই কর্ম্মধারায় তাঁহার সাফল্য এতটা হইত কিনা সন্দেহ।

ঐ সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘদিন আচার্য্যদেবের আদেশ-নির্দ্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, বন্ধুবর অবনী মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। আচার্য্য জগদীশের তিনি নিকট আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত সহকারী। সেই কারণে তাঁহার এই বিবৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইহা জীবনী নয়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবনের অন্তর্দিকের একটি ঘনিষ্ঠ চিত্র।

এই বিবৃতির আর একটি দিকও লক্ষণীয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যেখানে তাঁহার কর্ম্মজীবনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনা করেন, সেই অঞ্চলের স্থান-মাহাত্ম্য বিষয়ে তিনি অনেকখানি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অতীতে এই অঞ্চলে বাঙালীর মনীষা ও জ্ঞানের যে নানা উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, সে কথায় কিছু নির্দ্দেশও লেখক এই পুস্তিকায় দিয়াছেন।

বাস্তবিকই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, আনন্দমোহন,

আচার্য্য জগদীশ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিসৌরভ-বিজড়িত এই অঞ্চল, [illegible] এক পুণ্যক্ষেত্র। এখনও এখানে বসু-বিজ্ঞান [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কেন্দ্র, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রপীঠ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা কেন্দ্র, সিটি কলেজ, রামমোহন লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া মহিলা শিক্ষালয় ইত্যাদি বাঙালীর জীবনে শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনগঠনে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়া চলিয়াছে।

একটা চলতি কথা আছে যে, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। কথাটা ঠিক নয় [illegible] মধ্যে এক মারাত্মক ভুল জড়িত আছে। আমরা [illegible] পড়িয়াছি এবং সেই কারণে লঘু-গুরু প্রভেদ বিচারে অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছি। যাহার ফলে আমাদের মানসিক অবসাদ ও ব্যর্থতাজনিত তিক্ততা আমাদের কর্মজীবনকে ভারাক্রান্ত ও আন্তরিক তেজকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ইহার প্রতিকার সহজ নয়, কিন্তু মনে হয় যে, যদি এই সকল পুণ্যক্ষেত্রে যে সকল সাধক অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া, অশেষ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঐরূপ নানা প্রতিষ্ঠান, নানা কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্র স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিবৃতি যদি ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে সাহিত্যের সরস ভাষায় ব্যক্ত হয়, তবে দেশের লোকের মনে ভরসা ফিরিয়া আসিতে পারে। অবনীবাবু সেই কথাই বলিয়াছেন। যাহারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুণ্য তীর্থে অনেক প্রেরণা পাইবেন।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১

৯৩/১, আপার সার্কুলার রোডস্থিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরটি প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে কলকাতাবাসী অনেকেরই হয়তো চোখে পড়ে। হিন্দু স্থাপত্যকলা অনুসারে এই ভবনটি গঠিত। দেশবাসীরা একথাও জানেন যে, বর্তমান ভারতের বিজ্ঞান-চিন্তার পথিকৃৎ আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের সকল সঞ্চয় একত্রিত করে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই মন্দির স্থাপন করে গেছেন। তবু এই বিজ্ঞান-মন্দিরের সকল অংশের পরিচয় জনসাধারণ জানেন না—একথা মনে করবার কারণ আছে। অবশ্য বিজ্ঞানচর্চা উপলক্ষে যাঁরা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গঠনরীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে স্পষ্ট ধারণা নেই, তার পরিচয় আমি বিশেষ করে পাই ১৯৫৮ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে। তখন এই বিজ্ঞান-মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত বিরাট চত্বরে মণ্ডপ রচনা করে যেমন একটি বড় সভার আয়োজন করা হয়েছিল, তেমনই একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল। শতবার্ষিকী উৎসবের সময় যে হাজার হাজার নরনারী বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে এসেছিলেন, তাঁরা এর মধ্যবর্তী বিরাট চত্বর বা লন, সুরম্য উদ্যান ও গৃহবিন্যাস দেখে শুধু মুগ্ধই হন নি, বিস্মিতও হয়েছিলেন।

বিস্ময়ের কারণ এই যে, আপার সার্কুলার রোডের মত ঘন গৃহশ্রেণী সন্নিবিষ্ট কর্মচঞ্চল একটি রাজপথে এতখানি জায়গা নিয়ে এমন সুবিন্যস্তভাবে যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে, এ তাঁদের কল্পনারও অতীত। বস্তুতঃ বাইরে থেকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে দেখে তার আভ্যন্তরীণ প্রশস্ততা ও শিল্প-সৌকর্যের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। আচার্যদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সময় বহু দর্শকের বহুবিধ কৌতূহল আমাকে মেটাতে হয়েছিল। জনসাধারণের অবগতির জন্যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনার ইচ্ছা তখনই আমার মনে জাগে।

আমার এই রচনা-প্রয়াসের অন্য একটি নিগূঢ় কারণও আছে। সেটা হলো—কলকাতার যে অঞ্চলে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, মোটামুটি তার একটা পরিচয় জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। কারণ আমার নিজের ধারণা এই যে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির কলকাতা শহরের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যে এই আপার সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার পিছনে কিছুটা কার্যকারণ সম্পর্কিত যুক্তিও আছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, আমার বালক বয়স থেকেই জগদীশচন্দ্রকে নিকট থেকে নানাভাবে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর মহান কর্মপ্রচেষ্টায় অংশীদার হবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার যুবা বয়স থেকেই হয়েছিল। আজ তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ও অন্যান্য কর্ম-প্রয়াসের সামান্য সেবকরূপে আমি এখনও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

ব্যক্তিগতভাবে আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন আমার পিস্‌তুতো দাদা। তাই বালক বয়স থেকেই তাঁর স্নেহ লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার কর্মসাহচর্যের যোগাযোগ ১৯১৭ সালের দিকে হলেও তাঁর সঙ্গে পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে আমার যোগাযোগ হয়েছিল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকেই। তাঁর সংগ্রামী জীবনের একটি পর্যায় যেমন আমি দেখেছি, তেমনই দেখেছি তাঁকে সাফল্যের শীর্ষদেশে আরোহণ করতে।

তাঁর জীবন ও কর্মধারার সঙ্গে এই যে আমার দীর্ঘকালের যোগাযোগ, এর মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার পরিচয় বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত। সেই সব ঘটনার কাহিনী আমি যদি লিপিবদ্ধ করে যেতে না পারি, তাহলে সেগুলি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে এবং জগদীশ-চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিকও জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত থাকবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে আচার্যদেবের পূত-চরিত্র, জীবনকাহিনী এবং এদেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারকল্পে তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রয়াসের কথা জানবার জন্যে জনমানসে যখন এত আগ্রহ আছে, সে কথা অবহিত হয়েও তাঁর জীবনের সকল তথ্য প্রকাশ না করা ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের কাছে অপরাধের সামিল হবে বলেই মনে করি। ভবিষ্যতে যদি আচার্যদেবের কোন পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচিত হয়, তাহলেও এ-জাতীয় তথ্যাদির প্রয়োজন হবে। এই রকম নানাদিক ভেবে আমি স্থির করি যে, আচার্যদেবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-সাধনার যেটুকু

পরিচয় আমি ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে পেয়েছি, তা লিপিবদ্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই এই পুস্তিকার অবতারণা।

জীবন-সায়াহ্নে আমি আজ অশক্তদেহ ; নিজ হাতে পুস্তিকা রচনার ক্ষমতা আমার আজ নেই। তাছাড়া জীবনে বহু প্রকার কাজ করলেও লেখার কাজ বড় একটা কোনদিনই করি নি। তাই এই পুস্তিকা রচনায় আমি সাহায্য নিয়েছি আমার সোদরোপম স্নেহাস্পদ সাহিত্যিক শ্রীমান গোপাল ভৌমিকের। আমি মুখে মুখে আমার দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি অবলম্বনে যা যা বলেছি, তিনি তাঁর লেখনী-কৌশলে তাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এই পুস্তিকায়। স্মৃতি অবলম্বনে রচিত বলে সাল-তারিখের কিছু কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক—আশা করি পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে সে ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন। তবে তথ্যগত ভুল-ত্রুটি বড় একটা নেই বলেই আমার ধারণা। এখানে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রের যে দিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, তার সঙ্গে আমি নিজে বিশেষভাবে জড়িত থাকায় আমার নিজের কথাও হয়তো কিছু কিছু এসে পড়েছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা সে ত্রুটিও ক্ষমার চোখে দেখবেন। তবে আমি যথাসাধ্য নিজেকে গৌণ-ভূমিকায় রেখে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করবার চেষ্টাই করেছি।

২

আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি ছয় কি সাত বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় আসি। আমার বাবার কর্মস্থল ছিল রাজসাহী। ছোট বয়সে যখন কলকাতার আসতাম, তখন আত্মীয়তার সূত্রে আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা হতো। তখন থেকেই আমি তাঁর অকৃপণ ও অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছিলাম। তাঁর তিরোধান পর্যন্ত আমার প্রতি তাঁর এই স্নেহ ছিল অক্ষুণ্ন। ১৮[illegible] দেবের দেহত্যাগের সময় পর্যন্ত ৪৫ বছর আমি এই মহাপুরুষের নিবিড় সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের দিদি স্বর্ণপ্রভা ছিলেন আনন্দমোহন বসুর পত্নী। পরবর্তী ভগ্নী সুবর্ণপ্রভা ছিলেন আনন্দমোহনেরই ভ্রাতা মোহিনীমোহনের পত্নী। তাঁর অপর তিন ভগ্নীর মধ্যে লাবণ্যপ্রভা নিজে সুলেখিকা ছিলেন এবং শিক্ষাপ্রচারেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক আচার্য হেমচন্দ্র সরকারের পত্নী। হেমপ্রভা বেথুন কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী চারুপ্রভা অল্প বয়সে ১৯০৪ সালে মারা যান।

আচার্যদেবের সঙ্গে যখন আমার প্রথম যোগাযোগ হয়, তখন তিনি থাকতেন এন্টালির কনভেণ্ট রোডে। ১৮৯৮ সালে তিনি আপার সার্কুলার রোডের রাজাবাজার এলাকায় এসে

বসবাস সুরু করেন। এখানে আচার্যদেবের পাশের বাড়িতে থাকতেন তাঁর ভগ্নীপতি মোহিনীমোহন বসু। বসবাসসূত্রে আচার্যদেবের রাজাবাজার এলাকায় আগমনকে আমি তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা বলে মনে করি। পরবর্তীকালে এই এলাকাই হয়ে উঠেছিল তাঁর গৌরবময় কর্ম-জীবনের প্রধান ক্ষেত্র এবং এই অঞ্চলেই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে একে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের তীর্থক্ষেত্র করে গেছেন।

আচার্যদেব যখন এই রাজাবাজার অঞ্চলে বসবাস করতে আসেন, তখন এই এলাকায় পথঘাট আদৌ ভাল ছিল না। গোটা এলাকাটিই প্রায় বস্তিবাড়িতে ভর্তি ছিল। তারই মধ্যে মধ্যে ছিল দুই-চারটি ধনীগৃহ। সে সময়ে আমরা যখন কলকাতায় আসতাম, তখন হয় আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে অথবা জগদীশচন্দ্রের বাসগৃহসংলগ্ন তাঁর ভগ্নীপতি মোহিনী-মোহনের বাড়িতে উঠতাম। আমার মনে আছে যে, এই সময় জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসু সাইকেল চড়া শেখেন। এঁরা দু-জন ও সার নীলরতন সরকার প্রায়ই সাইকেলে চড়ে শিবপুর যাতায়াত করতেন। এই সময়ের আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। মোহিনীমোহনের বাড়িতে বেশ উন্মুক্ত একটি বড় প্রাঙ্গণ ছিল। সেখানে পাড়ার ছেলেরা খেলাধুলা করতো। মোহিনীমোহনের বাড়ির এই খেলাধুলা থেকেই আজকের প্রখ্যাত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সূত্রপাত হয়।

১৯০১ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র রাজাবাজার এলাকার

কাছাকাছি ৯৩নং আপার সার্কুলার রোডে নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করান। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভগ্নীপতি মোহিনীমোহন, আর একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ (দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর নাম আজ আর মনে নেই), রাজশেখর বসুর পিতা (?) প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট লোকই এই অঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণ করান। সার নীলরতন সরকার প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রয়াসে "স্কুল অব ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জেন্স" নামক নতুন দেশীয় চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এই অঞ্চলে। প্রায় একই সময়ে জগদীশচন্দ্রের ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা ও ব্রাহ্মসমাজের কর্মিগণের মিলিত প্রয়াসে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। পরে ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সার নীলরতনের মাধ্যমে আপার সার্কুলার রোডস্থিত উক্ত "স্কুল অব ফিজিসিয়ান্সের" গৃহটি কিনে সেখানে ঐ বালিকা-বিদ্যালয় তুলে আনেন। সার নীলরতন ঐ চিকিৎসা-বিদ্যালয়টি তুলে নিয়ে যান বেলগাছিয়ায় এবং আর. জি. করের মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে সেটি সংযুক্ত করেন। বর্তমানে এর রূপান্তর ঘটেছে সুবিখ্যাত আর. জি. করের মেডিক্যাল কলেজে। বলা বাহুল্য, এই স্বদেশী মেডিক্যাল কলেজের প্রকৃত জনক হলো "স্কুল অব ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জেন্স" এবং তার জন্মভূমি জন্মস্থান রাজাবাজারের নিকটবর্তী আপার সার্কুলার রোড। জগদীশচন্দ্রের নিজের বাড়ির প্রায় পাশেই ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে ১৯০২-৩ (?) সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রয়াসে বেঙ্গল কেমিক্যালের গোড়াপত্তন হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঐ গৃহেরই দোতলায় বাস করতেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসু ম্যানেজার হিসেবে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগদান করেন।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেটা ছিল আমাদের স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষাপ্রসারের স্বর্ণযুগ। তখন একদিকে চলেছে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্যে আন্দোলন এবং অপর দিকে চলেছে ইংরেজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পবাণিজ্য গড়ে তোলবার গঠনমূলক কর্মপ্রয়াস ও জনসমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা। এই অবস্থায় ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে সার নীলরতন প্রভৃতির প্রয়াসে 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনে'র সৃষ্টি হয় ও স্থাপিত হয় টেকনিক্যাল স্কুল বা কারিগরী বিদ্যালয়। পরে সার তারকনাথ পালিত যখন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িটি কিনে নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, তখন 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন' তার টেকনিক্যাল স্কুল সহ প্রথমে মুরারিপুকুরে ও তারপরে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং যাদবপুরে আজ যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তারও গোড়াপত্তন হয়েছিল এই আপার সার্কুলার রোডে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়ি ভেঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় আমার মাতুল সরোজেন্দু গুহ এই অঞ্চলে সুকিয়া স্ট্রীটে 'বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী' নামে প্রথম দেশীয় সাবান-কারখানা স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের



বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রধান প্রবেশ দ্বার

বাগানবাড়িতে সার নীলরতনও 'ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী' নামে একটি সাবান-কারখানা স্থাপন করেন।

সরকারী কলেজের অধ্যাপনা থেকে জগদীশচন্দ্রের অবসর গ্রহণের কথা ছিল ১৯১৬-১৭ সালে। তার বহু পূর্বেই তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা মনে মনে করে রেখেছিলেন। এই জাতীয় একটি বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপনের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একাধিক। তিনি যখন নিজের গবেষণাগারে বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতা নিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাণের সমতা বিষয়ে যুগান্তকারী গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন দেশের সর্বত্র পরিচালিত হচ্ছিল জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ গণ-জাগরণ। বিদেশী শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে নিজের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল, তার সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও সে আন্দোলনের ঢেউ তাঁর বিজ্ঞানাগারের নিভৃততম কোণে এসেও লেগেছিল। দেশ ও জাতিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন বলে এই সত্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজকে কোনক্রমে তাড়িয়ে দিতে পারলেই আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার অবসান ঘটবে না, বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বহু নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ভাবী যুগের অগ্রগতি যে বিশেষভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে—এই সত্যও এই বিজ্ঞান-সাধক তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। স্বীয় জীবনে বহুবার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের সুযোগ তিনি

পেয়েছিলেন। সে সব দেশে বিজ্ঞানচর্চার যে প্রসার ও বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি তিনি দেখেছিলেন, তাতে এই বিষয়ে নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের অনগ্রসরতা দেখে এই দেশ-প্রেমিকের মন নিশ্চয়ই পীড়িত হয়ে উঠেছিল। তাই নিজের প্রয়াসে এই অভাব দূরীকরণের জন্যে তিনি বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতের সম্পদ শোষণকামী ইংরেজ সরকার যে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে সোৎসাহ সহযোগিতা করবে না, এই অতি সত্য কথাও তাঁর অজানা ছিল না। নিজের কর্মজীবনে বিজ্ঞানসাধনায় তিনি পদে পদে বাধাই পেয়ে এসেছেন শাসকবৃন্দের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। তিনি সরকারী কলেজেই অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু যখনই তিনি বিজ্ঞানচর্চার সুবিধার জন্যে সরকারের কাছে নতুন কোন যন্ত্রপাতি কেনবার প্রস্তাব করতেন, তখনই বাধা আসতো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। চাকুরী জীবনে বিজ্ঞান-সাধনায় যে কৃতিত্ব তিনি প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন, তা তাঁকে প্রতিপদে শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই করতে হয়েছিল। অনেক সময় এই অনাবশ্যক বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে তিনি যেতে চাইতেন না বলে নিজের গবেষণার পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনি নিজের পরিকল্পনানুযায়ী তৈরি করিয়ে নিতেন। তাঁর পরিকল্পিত এ-রকম যন্ত্রপাতি এখনও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে রক্ষিত আছে।

যাহোক, নিজের জীবনে তিনি বিজ্ঞানচর্চা করতে গিয়ে যে সব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, ভাবী যুগের বিজ্ঞান-

শিক্ষার্থীরা যাতে তার সম্মুখীন না হয়, সে ব্যবস্থা করাও ছিল বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে এই যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সমগ্র দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে সহায়তা করা এবং ভাবী যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের অভাব অসুবিধা দূর করা, তা আজ বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে। আজ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতের সর্বত্র সকল বিজ্ঞানাগার ও গবেষণাগারে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁদের অর্থানুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রের নানাদিকে এর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত এবং এই বিজ্ঞান-মন্দিরের অঙ্গ হিসেবে একাধিক শাখা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়েছে। আমি যথা-স্থানে এ-বিষয়ে আরও আলোচনা করবো।

বর্তমানে এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বের আলোচনা করি। পূর্বেই বলেছি, আচার্য জগদীশচন্দ্র সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের বহু পূর্বেই এই জাতীয় একটি বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপন করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার প্রমাণ পাই যখন দেখি যে, সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার বছর সাতেক আগেই আপার সার্কুলার রোডে নিজের গৃহসংলগ্ন ৫০ কাঠা জমি (৮০ ফুট চওড়া ও ৪০০ ফুট লম্বা) কিনেছেন। জমিটা তাঁর বাসগৃহের উত্তর দিকে এবং এটি কিনেছিলেন তিনি মহম্মদ আরিফ নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে।

জগদীশচন্দ্র যে যুগের মানুষ ছিলেন, সে যুগে একদিকে যেমন দেখা দিয়েছিল উগ্র স্বদেশী আন্দোলন, তেমনই অপর দিকে ছিল একটি ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়। তাঁরা ছিলেন বিলাতী শিক্ষাদীক্ষায় উদ্বুদ্ধ। এই পর্যায়ের ব্যক্তিরা প্রায়শঃই সাহেবী এলাকায়, পাশ্চাত্য ধরণ-ধারণে জীবনযাপন করতেন। জগদীশ-চন্দ্র বিলাতে শিক্ষালাভ করলেও এবং তাঁর জীবনে বহু পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের সুযোগ হলেও তিনি পাশ্চাত্য জীবন-ধারার উপাসক ছিলেন না। বিলাস-ব্যসন তাঁর চরিত্রে ছিল না বললেই হয়। তাই তিনি চিরকাল অল্পব্যয়ে "নেটিভ" পাড়াতেই বসবাস করে গেছেন।

অনেক দিক ভেবেই তিনি তাঁর গৃহের সংলগ্ন এলাকায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই পল্লীটি পাশ্চাত্যভাবাপন্নদের মতে অভিজাত পল্লী না হলেও সেটি এমন একটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যার দান আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কম নয়! প্রাচীনতম কলকাতা মহানগরী বলতে যা বোঝায়, এই পল্লী সেই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণে শিয়ালদহ ও উত্তরে মানিকতলার মধ্যবর্তী কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট ও আপার সার্কুলার রোডটি আমাদের জাতীয়তার অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার, তথা ভারতের নবজাগরণের যিনি প্রথম প্রাণপুরুষ ছিলেন, সেই রাজা রামমোহন রায় থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

আমাদের জাতীয়তাবোধ, শিল্প ও সাহিত্যচিন্তায় নবজাগরণ বা রেনেশাসের প্রথম অগ্রদূত রাজা রামমোহন। কালের

অগ্রগতির ফলে তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের আজ আর কোন বিপ্লবীর ভূমিকা নেই। কিন্তু এক সময় এই ব্রাহ্মধর্মই হাজার হাজার বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানকে রক্ষা করেছিল খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আকর্ষণ থেকে। ব্রাহ্মধর্মের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকদের প্রচারকার্যের ফলে গোঁড়া হিন্দুধর্মের অনেক কুসংস্কার যে দূরীভূত হয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ব্রাহ্মধর্মের অনুসরণে হিন্দুধর্মের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা সংস্কারপন্থী আন্দোলন।

এই সংস্কারপন্থীদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম মনে পড়ে, তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়েব বাসগৃহও এই এলাকায় বাদুড়বাগানে অবস্থিত। দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গৃহও শিয়ালদহের কাছাকাছি আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। ধর্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের গৃহ 'কমলকুটীর'ও এই আপার সার্কুলার রোডেই ছিল। কমলকুটীর বর্তমানে ভিক্টোরিয়া কলেজের গৃহে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী যুগে ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে এই আপার সার্কুলার রোডেই উঠে এসেছিল এবং এখনও সেখানেই অবস্থিত আছে। পরবর্তী কালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্যা পত্নী লেডী অবলা বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিতে বিধবাদের সাহায্যকল্পে যে বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও নারী-শিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন, তাদেরও প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় আপার সার্কুলার রোডে। এই রাস্তার উপরেই স্থাপিত হয়েছিল এস. কে. মল্লিকের মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমানে

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ), স্যার নীলরতনের স্কুল অব ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জেন্স, কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথম দেশীয় ব্লক নির্মাণের প্রতিষ্ঠান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল ও একাধিক দেশীয় সাবান-কারখানা স্থাপনের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, রামমোহন লাইব্রেরী সবকটিরই অবস্থান আপার সার্কুলার রোডে। দেশাত্মবোধ প্রচারের অন্যতম অগ্রণী সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' কার্যালয়ও আপার সার্কুলার রোডে। 'প্রবাসী'র মাধ্যমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও কয়েকটি ভূমিকায়' অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কঠোর লেখনীর দ্বারা নিরলস ইংরেজ সরকারের কুকীর্তি জনসমাজে প্রকাশ করে যাওয়া ছাড়াও [illegible] প্রচারের অগ্রদূত এবং অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য চিত্রাবলীর 'প্রিণ্ট' প্রচারের দ্বারা ভারতীয় চিত্রকলার 'রেনেসাঁর' অন্যতম সাহায্যকারী।

উপরে যে বর্ণনা দিলাম, তা থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যাবে যে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির যে পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল, সে পরিবেশ অভিজাত হোক বা না হোক, তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত গঠনমূলক কর্মপ্রয়াস। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের দিক থেকেও সে পরিবেশ ছিল খুবই অনুকূল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অতি সন্নিকটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলের

এই অনুকূল আবহাওয়ারই পরিচায়ক। সার নীলরতন সরকারের প্রভাবে সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের বহু লক্ষ টাকা দানের ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

১৯০৫-৬ সালে স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলন উপলক্ষে আপার সার্কুলার রোড এলাকায় যে প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মোদ্যম দেখা দিয়েছিল, তার কিছু কিছু স্মৃতি এখনও সুস্পষ্ট রূপে আমার মানসপটে অঙ্কিত আছে। জগদীশচন্দ্র কর্মসূত্রে সরকারী চাকুরে হলেও তাঁর মধ্যে পূর্বাপর দেশপ্রেমের একটা ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল। দেশ ও জাতিগঠনের সর্বপ্রকার গঠনমূলক প্রয়াসের প্রতি তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সমর্থক। [illegible] বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থান নির্বাচনে তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে নি—এমন কথা বলা চলে না। আমার মনে আছে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা তরুণেরা প্রায়ই মার্চ করে [illegible] আপার সার্কুলার রোডের গ্রীয়ার পার্কে, অর্থাৎ [illegible]। সেখানে প্রায়ই সভা হতো এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সে সভায় দেশাত্মবোধক বক্তৃতাদি দিতেন। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। ১৯০৫ সাল। জগদীশচন্দ্রের ভগ্নীপতি আনন্দমোহন তখন অসুস্থ হয়ে জগদীশচন্দ্রের বাড়ীর দোতলায় বাস করছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের উত্তরে প্রশস্ত ময়দানে বিরাট রাখীবন্ধন উৎসবের

আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে ঐ স্থানে ফেডারেশন হলেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই কর্মযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন আনন্দমোহন। তিনি এত অসুস্থ ছিলেন যে, তাঁকে স্ট্রেচারে করে ময়দানের উৎসবে নিয়ে যেতে হয়েছিল। অথচ এই শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে আনন্দমোহন তাঁর ভাষণ নিজে রচনা করেছিলেন। ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন তিনিই। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে নিজের ভাষণ নিজে তিনি পাঠ করতে পারেন নি। তাঁর ইংরেজী ভাষণ পাঠ করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—"ভাই ভাই একঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" আর সমবেত জনসমাজ সমস্বরে সেদিন এই শপথ গ্রহণ করেছিল। সেই সঙ্গে একে অপরের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন ভ্রাতৃত্ব ও সৌভাগ্যের রাখী। এমনি ভাবেই বাঙ্গালী জাতি সেদিন ইংরেজ শাসকদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, বঙ্গবিভাগ তারা মেনে নেবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে সেই একই বাঙ্গালী জাতি আবার বঙ্গবিভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীনতাকে জানিয়েছিল অভ্যর্থনা। কিন্তু সে অন্য কথা। সেদিন রাখীবন্ধন উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে—

'বাংলার মাটি বাংলার জল'

সঙ্গীতটি আজও আমার কানে বাজে। সেদিনকার সেই জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। সেদিন রাখীবন্ধনের উৎসব শেষে সমবেত জনসমাজ পায়ে হেঁটে



উদ্ভিদ বিজ্ঞানাগার

বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ি উপস্থিত হয়ে সেখানে জাতীয় ধনভাণ্ডারে প্রত্যেকে নিজের সাধ্যানুসারে দান করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বলি। ফেডারেশন ময়দানের অনেকাংশ ক্রমে ক্রমে বিক্রি হয়ে গেল। এখন উত্তর-পশ্চিম দিকে এক বিঘা জমি আছে, এই জমিতে সার্কুলার রোডের উপর স্বর্গতঃ ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় একটি হল নির্মিত হয়েছে। তাঁর বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাকী জমিতে প্রকাণ্ড একটি হল ও পাঠাগার নির্মাণ করবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি তাঁর আকস্মিক তিরোধানের ফলে তিনি তাঁর পরিকল্পনার রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি।

উপরে যে আলোচনা করলাম তাথেকে দেখা যায় যে, আমরা যে স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে গর্ব বোধ করি এবং যে আন্দোলন আমাদের পরবর্তী যুগের সকল স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক-বিশেষ, তারও উদ্ভব আমার বর্ণিত আপার সার্কুলার রোড এলাকা। সেই এলাকায় দেশপ্রেমিক আচার্য জগদীশচন্দ্রের বসু বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপিত হবে, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

এ-প্রসঙ্গে আমার নিজের দু-চারটি কথা বলে নিতে চাই। আমি এখানে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনের যে দিকটির উপর আলোকসম্পাত করতে চাইছি, তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের দু চারটি ঘটনার অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে বলেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা যখন বিদেশী পণ্য বর্জনের উৎসাহী সৈনিক, তখন দেশে কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন যাঁরা বুঝেছিলেন যে, কেবলমাত্র বিদেশী

পণ্য বর্জনের নেতিবাচক কর্মনীতির দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত ফললাভ হবে না। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পুরাপুরি অসহযোগিতা করতে হলে আমাদের জাতি হিসেবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে, সে জন্যে প্রয়োজন হলো গঠন-মূলক কর্মপ্রয়াসের। যাঁরা এরূপ গঠনাত্মক কর্মোদ্যোগের কথা ভেবেছিলেন, তাঁদের কারও কারও কথা আজও দেশবাসীর মনে আছে, আবার কোন কোন নীরব কর্মী বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের এরূপ গঠনাত্মক কর্মপ্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চর্চার দিকে; সার নীলরতন সরকার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কর্মবীরদের প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের দিকে। সে যুগের এমনই আর একজন গঠনমূলক মনোভাবের দেশপ্রেমিক কর্মী ছিলেন সার চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। তিনি নিজে ছিলেন হাইকোর্টের উকীল। দেশগঠনমূলক কাজে তাঁর নীরব দান ও কর্মপ্রচেষ্টার কথা দেশবাসীরা আজ ভুলে গেছে। তাঁকে আমরা প্রায়ই বলতে শুনতাম যে, বিদেশী পণ্যবর্জন ভাল হলেও সমগুণের স্বদেশী পণ্য উৎপাদনের প্রয়াস আমাদের করা উচিত। প্রয়োজন হলে বিদেশে গিয়ে সেইরূপ পণ্য উৎপাদন করবার কলাকৌশল আয়ত্ত করে আসা উচিত।

এগুলি যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মুখের কথামাত্র ছিল না। তিনি তাঁর এই কর্মনীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার

চেষ্টাও করেছিলেন। প্রধানত: তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত শিক্ষার উন্নয়নকল্পে 'Advancement of Scientific & Industrial Education for Indians' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল এবং তার নিজস্ব একটি ধনভাণ্ডারও সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারতীয় যুবকগণ যাতে বিদেশে কারিগরী জ্ঞানার্জনের সুবিধা পায়, সে জন্যে এই ধনভাণ্ডার থেকে অর্থসাহায্য করা হতো। শ্রীযুক্ত ঘোষের এই ধনভাণ্ডার থেকে প্রতি ছাত্রের পুরা ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হতো না—নিয়মিত আংশিক ব্যয়ভার বহন করা হতো। বলা বাহুল্য, এই সাহায্যের পরিমাণও সে যুগে বড় কম ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল হ্যামিল্টন নগরের প্রতিষ্ঠাতা সার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের সাহায্য। এই ভারত-প্রেমিক ইংরেজের বৃটিশ-ইণ্ডিয়া স্টীমার কোম্পানীর জাহাজে বিনা ভাড়ায় বা অর্ধ ভাড়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বাঙ্গালী যুবকদের নানা বিদ্যা শিক্ষার জন্যে পাঠাতেন বিলাতে, জাপানে ও আমেরিকায়। এভাবে আমরা ষোলজন যুবক একসঙ্গে ১৯০৬ সালে জাপানে যাত্রা করি, কারিগরী বিদ্যা অর্জনের জন্যে।

আমাদের স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশ-যাত্রার দিনটির স্মৃতি আমার এই পরিণত বয়সেও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন বিদেশ-যাত্রার জন্যে আমরা যে ষোলজন যুবক কলকাতায় একত্রিত হয়েছিলাম, তারা ছিল বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। তাদের বিদায় জানাবার জন্যে সেদিন তাদের কোন আত্মীয়-স্বজনই উপস্থিত ছিল না। বোধহয় বিদেশগামী আমাদের

মনের অবস্থা উপলব্ধি করেই সেদিন আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সভায় মাতৃমূর্তিতে উপস্থিত হয়েছিলেন স্যার নীলরতনের পত্নী শ্রীযুক্তা নির্মলা সরকার। মায়ের মতই তিনি ছলছল চোখে ও ভারাক্রান্ত মনে আমাদের প্রত্যেককে স্নেহাশীর্বাদ জানিয়েছিলেন বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে। শুধু তাই নয়, জাহাজে উঠে যাতে আমরা কোন অসুবিধায় না পড়ি এবং বিদায়ের সময় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি বলে যাতে বেদনাবোধ না করি, সে উদ্দেশ্যে তিনি পথে খাবার জন্যে প্রত্যেককে এক বাক্স করে জ্যাম-জেলী ইত্যাদি উপহার দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেককে তিনি হাতখরচা বাবদ এক গিনি করে দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্তা সরকারের বিদায়কালীন আশীর্বাদ যে আমাদের জীবনে সফল হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বিদেশ থেকে নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে দেশে ফিরে এসে নিত্য নতুন দেশীয় শিল্পের প্রবর্তন করেছিল।

১৯০৮ সালে অন্যান্য শিল্পসহ, বিশেষ করে বিস্কুট তৈরীর বিদ্যা শিখে আমি জাপান থেকে স্বদেশে ফিরে আসি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছোট একটি স্বদেশী বিস্কুট তৈরীর কারখানায় কাজ করতাম। এই সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁর প্রস্তাবিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনার কথা আমাকে বলেন এবং আমারই উপর সেই গৃহ নির্মাণের নকশা তৈরী প্রভৃতির ভার অর্পণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি সানন্দে সেই ভার

গ্রহণ করি এবং আমার সাধ্যানুসারে আমি আমার কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছি। তবে যে কথা ভাবলে আমি বিস্মিত হই, সেটা হলো এই যে, আমার মধ্যে যে স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে অনুরাগ ছিল, তা আমার নিজের কাছেই প্রায় অজ্ঞাত ছিল। আমার সেই সুপ্ত শক্তির সন্ধান পেয়ে আচার্যদেব আমার মত একজন সাধারণ বিস্কুট তৈরীর কারিগরকে রূপান্তরিত করেছিলেন স্থপতিতে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণে আমি যেটুকু কৃতিত্ব দেখিয়েছি, তার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আমার হলেও পরোক্ষভাবে সকল দায়িত্বই আচার্যদেবের। মানুষের কার মধ্যে কি শক্তি আছে, তা তিনি অতি সহজেই ধরতে পারতেন এবং তাকে সেইভাবেই কাজে নিয়োগ করতেন। প্রতি পদে তিনি তাঁর কর্মীদের মধ্যে জাগাতেন অনুপ্রেরণা। তাঁর নেতৃত্বে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা জানেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করে কত সুখ ছিল। প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার দিকে যেমন তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকতো, তেমনই প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তার কাছ থেকে সর্ববিধ কাজ আদায় করবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

যাহোক, আমি আচার্যদেবের নির্দেশে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের ভার গ্রহণ করি এবং তাঁরই প্রেরণায় সারনাথ, বারাণসী, চুনার প্রভৃতি ভারতের বহু বিশিষ্ট স্থানে গিয়ে আমাদের প্রাচীন গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি অনুধাবনের চেষ্টা করি। এইভাবে আমি বিশেষ ভারতীয় মতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের নক্শা তৈরি করি। বলা বাহুল্য যে, এই কাজে প্রতিপদে আমাকে

নানাবিধ উপদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন আচার্যদেব স্বয়ং। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আমি একটা শিল্পীসত্তার অস্তিত্ব সর্বদাই লক্ষ্য করেছি। তাঁর এই শিল্পীসত্তাই আমার হাত দিয়ে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের মত দুরূহ কাজ করিয়ে নিয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নতুবা বিস্কুটের কারিগরের পক্ষে স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হতো বলেই আমার ধারণা।

৩

কোন্ পদ্ধতিতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই বিজ্ঞান-মন্দিরের অভ্যন্তরেই বা ব্যবস্থাদি কিরূপ, নীচে তার পরিচয় দেই।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের জন্যে আমি পাথর সংগ্রহ করি চুনারে, আর কারিগর সংগ্রহ করি বারাণসীতে। প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ১৯১৭ সালে প্রকৃত গৃহনির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়। গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে এবং ৩০শে নভেম্বর আচার্যদেবের জন্মদিনে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে কলকাতার জন-সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল। কলকাতা শহরের প্রায় ১,৫০০ গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হয়ে সেদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সভায় সমবেত হয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে একটি বিশেষ উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। গানটির প্রথম দুটি পংক্তি হলো—

"মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে
শুভ শঙ্খ বাজো হে বাজো হে।"

এই গানটি সমবেতকণ্ঠে গেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের একদল ছাত্রছাত্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে।

আমাদের পক্ষে দেড় হাজারের বেশী আমন্ত্রিত ব্যক্তির স্থান

সংকুলান করা সম্ভব হয় নি। অথচ এই উপলক্ষ করে সেদিন হাজার হাজার নরনারী ভিড় করেছিলেন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সামনে। এই আগ্রহাকুল জনসমাজকে আমাদের এই বলে শান্ত করতে হয়েছিল যে, যাঁরা সেদিন ভিতরে প্রবেশাধিকার পান নি, তাঁদের পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বক্তৃতাকক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই বন্দোবস্তে সমবেত নরনারী সেদিন হৃষ্টচিত্তেই গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র যদি নিছক বৈজ্ঞানিক মাত্রই হতেন, তাহলে তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গঠনপদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সে গৃহের গঠনপদ্ধতি যাই হোক না কেন, সেখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের যথোচিত ব্যবস্থা থাকলেই সুখী হতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হলেও তাঁর চরিত্রে ছিল শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুরাগ। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন পূর্ণতার সাধক। মানুষ হিসেবে পূর্ণতার সাধনা হলো ভারতীয় জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই পূর্ণতার সাধনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের বহুমুখী বৈচিত্র্য। তাই বিজ্ঞান-সাধক হয়েও সাহিত্য ও শিল্পপ্রীতি ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রধান অন্তরঙ্গ বন্ধু। সমকালীন শিল্পকলার আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগসূত্র ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। স্বীয়

চরিত্রের এই বহুমুখী দিকের তাগিদেই তিনি বিজ্ঞান-সাধনার নামে 'গজদন্ত-মিনার' (Ivory Tower) নির্মাণ করে বাস করেন নি, একদিনের জন্যেও। তাঁর কাছে বিজ্ঞান-সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ-সাধন ও জনগণকে বিজ্ঞানবুদ্ধি-সচেতন করে তোলা। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, পরাধীন মাতৃভূমির হৃত গৌরব জগৎসভায় পুনঃস্থাপিত করা ও বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণ করা।

আজ আমরা যে বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করছি, তাতে বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও চলতে পারি না। আজ আমরা কথায় কথায় বলি যে, আমরা 'পারমাণবিক যুগের' মানুষ। জগদীশচন্দ্র দিব্যদৃষ্টিতে পৃথিবীর এই বিবর্তন দেখতে পেয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার বনিয়াদ যদি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আগামী যুগে তার পক্ষে জগৎসভায় কোন উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করা সম্ভব হবে না। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র কত বড় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তার পরিচয় পাই তাঁর নিজের রচনাংশ থেকে—"যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

উপরে যে এতগুলি কথা বললাম, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জগদীশ-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বহুমুখিত্ব প্রদর্শন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গঠনে যে ভারতীয় নির্মাণপদ্ধতি এবং তার অভ্যন্তরে

যে সুকুমার শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলে ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের এই বহুমুখী প্রেরণা। তিনি সাধারণ সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হলে যে কোন ইঞ্জিনিয়ারের উপর এই গৃহনির্মাণের ভার দিয়ে খুশী থাকতেন, আমার মত একজন ব্যক্তিকে আহ্বান করে ভারতীয় গঠন রীতিতে বিজ্ঞান-মন্দিরের গৃহ গড়ে তোলবার নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি শিল্পী মন লুকিয়ে ছিল বলেই তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সুন্দর করে এবং একটা রুচিসম্মত মধুর পরিবেশে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আমার উপর এই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব পড়ায় আমাকেও বিষয়টি নিয়ে রীতিমত গবেষণা করতে হয়।

প্রথমেই আর্চ নির্মাণের কথা বলি। এই আর্চ নির্মাণে ইন্দ্রপস্থের ধরণ বা 'নমস্তে-আর্চ' প্রভৃতি হিন্দুযুগের যে সব গঠনরীতি আছে, সেগুলি ভারতের মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, জনমানসে সেগুলি হিন্দু-রীতির বৈশিষ্ট্য বলে আদৌ প্রতিভাত নয়। তাই আমি আর্চ নির্মাণে আরও পুরাতন যুগের 'লিন্টেল' পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করি। বাইরের তিনটি গেটে ছয়টি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর ছয়টি প্রদীপ-দান এবং স্তম্ভের মধ্যে পদ্মের প্যানেল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণে যে কারুকার্য করা হয়েছে, তাতে পদ্ম ও বজ্রের বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্ম হলো পবিত্রতা ও মাধুর্যের প্রতীক, আর বজ্র হলো বীর্যের প্রতীক। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি



ভগিনী নিবেদিতা

মৃদূনি কুসুমাদপি'—এই ছিল আচার্যের জীবনাদর্শ। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিকল্পনায় তিনি তাঁর এই মহৎ জীবনাদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন সকলের সম্মুখে।

এই গৃহের সম্মুখে যে তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, তার মধ্যে মাঝখানের গেটটি কাশ্মীরী কাঠের কাজ করা; মন্দির নির্মিত হবার বছরখানেক পরে আচার্য এই কাঠের গেটটি উপহার পেয়েছিলেন লাহোর থেকে এবং এটিই মধ্যের গেট রূপে বিদ্যমান। দক্ষিণ পার্শ্বের গেটটিও কাঠের তৈরী, কিন্তু এর গঠনরীতি ভিন্ন। এটি নির্মিত হয় দার্জিলিং-এর বৌদ্ধ গুম্ফার অনুকরণে। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের প্রধান পথে দু-দিকে দুটি কালো পাথরের ছোট স্তূপের মত বস্তু চোখে পড়ে। এগুলি সারনাথের কালো পাথরে তৈরী এবং এ দুটি আলোক-সজ্জার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রবেশপথে ঢুকে ঠিক সামনেই সামান্য একটু উন্মুক্ত স্থানে বাঁ-দিকের দেয়ালে দেখা যায়, ভগিনী নিবেদিতার একটি মূর্তি অঙ্কিত।

এই মহীয়সী নারীকে আমি প্রথম দেখি আচার্যদেবের গৃহে ১৯০৮ সালে। এঁর স্নেহ ছিল আমার প্রতি অপরিসীম। সেই সময় প্রতিদিন তিনি আচার্যদেবের গৃহে আসতেন, আচার্যদেবও শ্রীযুক্তা বসুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে রাত্রে আহার করে বাড়ী ফিরতেন। ভগিনী নিবেদিতা তখন থাকতেন বাগবাজারে। এখন সেই রাস্তার নাম হয়েছে নিবেদিতা লেন। আচার্যদেবের গৃহ ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মাঝখানে যে

গথিক টাইপের গেটটি আছে, সেটি তাঁহারই পরিকল্পিত এবং তাঁরই নির্দেশে আমি ১৯০৮ সালে এটি তৈরি করি।

তিনি ছিলেন শিল্পী। ভারতীয় স্থাপত্য-চিত্রকলাতেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলতেন, শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। আচার্যদেবের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর অনেক আলোচনা হতো। আমার মনে হয়, আচার্যদেব নিবেদিতার দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

আচার্যদেবের বিজ্ঞান গবেষণা ও লেবারেটরী গৃহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নিবেদিতার খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তা আর দেখে যেতে পারেন নি। নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও আচার্যদেবের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে [illegible] সঙ্গে নিবেদিতা দার্জিলিঙে যান। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকেন। শ্রীযুক্তা বসুর নিরলস সেবা ও অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি অমর ধামে যাত্রা করেন।

ভগিনী নিবেদিতার প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। ভগিনী নিবেদিতার [illegible] একটি দীপ [illegible] মূর্তি এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিল্পী [illegible]। মূর্তির নীচে পদ্মপরিপূর্ণ একটি ছোট জলাশয়, তার মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার দেহভস্ম রক্ষিত আছে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর সুবিন্যস্ত লেকচার হল অর্থাৎ বক্তৃতাকক্ষ। এ-রকম সুবিন্যস্ত, সুশোভিত ও কারুকার্যমণ্ডিত দ্বিতীয় কোনও বক্তৃতা-কক্ষ কলকাতায় কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। নানা দিকের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে এটি যাতে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদানের পক্ষে আদর্শ কক্ষ হয়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাঝের গেট দিয়ে ঢুকেই সামনে একটু ছোট চত্বর বা 'লন' পাওয়া যায় এবং এই লন পার হলেই লবির ধরণে [illegible] একটি হলঘর। তারপরে হলো বক্তৃতাকক্ষ। বক্তৃতাকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হল এবং তার সামনে একটি লন রাখবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। বসু-বিজ্ঞান মন্দির [illegible] জনবহুল বড় রাস্তার উপর স্থাপিত। সুতরাং বক্তৃতা চলবার কালে বক্তৃতাকক্ষে বাইরের বিরক্তিকর শব্দে বিঘ্ন ঘটবার আশঙ্কা থাকায় মাঝখানে এই লন ও হলের অবস্থিতি। এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া বক্তৃতার [illegible] শ্রোতারা ইচ্ছা করলে সামনের মাঠ ও সংলগ্ন লনে পদচারণা বা বিশ্রাম উপভোগও করতে পারেন

বক্তৃতাকক্ষটিতে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থাও এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে, যাতে কোন অবস্থাতেই হৈ-চৈ বা গণ্ডগোল হওয়া সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আসনে যাবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। ফলে একই প্রবেশপথে শ্রোতাদের ঠেলাঠেলির জন্যে অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। মাঝখানের গেট দিয়ে যাঁরা বক্তৃতাকক্ষে ঢুকতে চান, তাঁরা

সহজেই হল পার হয়ে মাঝের আসনগুলিতে বসতে পারেন। যাঁরা দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢোকেন, তাঁরা সহজে প্রথম দিকের আসনগুলিতে বসতে পারেন, আর উত্তর দিকের গেট দিয়ে ঢুকে সহজে পিছনের আসনে ও দোতলার গ্যালারীতে যাওয়া যায়। সভা ভঙ্গ হলে এই একই উপায়ে সহজেই বক্তৃতাকক্ষ থেকে অতি সহজেই বেরিয়ে আসা যায়।

হল থেকে বক্তৃতাকক্ষে ঢোকবার জন্যে মাঝে যে দরজাটি আছে, সেটি জয়পুরের কোন মন্দিরের অনুকরণে পাথরের কারুকার্য করা। কাঠের পাল্লার প্যানেলে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতীক পদ্মের মধ্যে বজ্র আঁকা। অন্য দুটি প্যানেলের একটিতে তামার তৈরী লজ্জাবতী লতা ও বনচাঁড়াল—এই দুটি উদ্ভিদ নিয়েই আচার্য্যদেব গবেষণা করতেন। মাঝে পিতলে অঙ্কিত "মাত্রে" অর্থাৎ মায়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত—কথাটি রয়েছে। এই গেটের ঊর্ধ্বে পাথরের স্তম্ভের উপর আছে হাওয়া ঘর—কাশীর বিখ্যাত মানমন্দিরের অনুসরণে গঠিত। প্যারাপেটে ছোট ছোট পাথরের স্তম্ভের উপর আমলকীর প্রতীক ও দুটি স্তম্ভের মাঝখানে পাথরের জালিকাটা কাজের রেলিং। মাঝের দরজার উপর বিখ্যাত রুশ শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিকের আঁকা হিমালয়ের দৃশ্য।

বক্তৃতাকক্ষে ঢোকবার আগেই যে হল পড়ে, সেই হলের দেয়াল-গাত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের প্রতিকৃতিতে সুসজ্জিত। নীচে কাচের আবরণের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রক্ষিত আছে। উত্তর দিকে

সুন্দর মর্মর প্রস্তরে তৈরী সোপানরাজি উঠে গেছে দোতলায়—বক্তৃতাকক্ষের গ্যালারীতে। রেলিং কাঠের তৈরী, ভারতীয় কা[illegible] করা।

এই হলে[illegible] সুখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী-কৃত আচার্যদেবের [illegible] মূর্তি সংরক্ষিত আছে। সে সময় এই দেশে ব্রোঞ্জ ঢা[illegible] না থাকায় শুরুতে দেবীপ্রসাদ এটি তৈরি করেছিলেন প্লাস[illegible]তে। এই মূর্তিটি নির্মাণের প্রায় দু-বছর [illegible] একবার বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শন [illegible] দেখেন এবং নিজে থেকেই ইটালীয় [illegible] ইটালীতে পাঠিয়ে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে এনে দেন।

বক্তৃতা[illegible] চোখে পড়ে কাঠের তৈরী বক্তৃতামঞ্চ এবং তার উপরে উঁচু বেদী। বক্তৃতামঞ্চের নীচে ছোট একটি ঘর আছে। [illegible] যে বক্তৃতা দিতেন তাতে প্রায়ই [illegible] বিষয় বোঝাবার জন্যে যন্ত্রের সাহা[illegible] গুলি শ্রোতৃবৃন্দের চোখের সামনে সব[illegible] উৎপাদন করুক, এ তিনি চাইতেন না। সে জ[illegible] করা হয়েছিল যে, মঞ্চের নীচে এই ছোট কক্ষটিতে একটি লোক যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে থাকবে। বক্তৃতার প্রয়োজন অনুসারে যন্ত্র নীচে থেকে উপরে চলে আসতো এবং প্রয়োজন শেষ হলে সেটা চলে যেত নীচে। যন্ত্রটি যখন মঞ্চের উপর চলে আসতো, তখন গ্যালারীর উপর থেকে শক্তিশালী আলো ফেলা হতো তার উপরে এবং সে

যন্ত্রের ছবি মঞ্চের পিছনে পর্দায় প্রতিফলিত হতো। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই সে ছবি দেখতে পেত।

মঞ্চের একদিকে তাম্রফলকে উৎকীর্ণ আছে উৎসর্গীকরণ—'এই মন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।' অন্যদিকে বাস্-রিলিফে পিতলে খোদাই করা আচার্যদেবের যন্ত্রপরীক্ষা-রত প্রতিমূর্তি। কাঠের বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখভাগে আছে সপ্তাশ্ব-বাহিত সূর্যদেবের চিত্র। অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকরণে এই চিত্রটি এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়। ছবিতে দেখা যায়, সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেব উঠে আসছেন ঢেউ-এর মধ্য থেকে, আর পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যাচ্ছে। এটি জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হবার প্রতীক-বিশেষ। ছবিটির উপর দিকে আছে দ্বাদশ অগ্নিশিখা—বারো মাসে সূর্যদেবের বারোটি অগ্নিময় রূপের প্রতীক।

সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যমূর্তি পিতলে খোদাই (emboss) করা। ঢাকাই কারিগর দিয়ে এই কাজ করানো হয়েছিল। তাঁরা সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে, পিতলের চাদর গালার উপর রেখে ঠুকে ঠুকে কয়েক মাসে এই অপূর্ব শিল্পকর্মটি পিতলের উপর উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের কথা ভাবলেও আশ্চর্য বোধ হয়। আজকের দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমাদের শিল্পকর্মে যান্ত্রিক উৎকর্ষ হয়তো অনেক বেড়েছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের কারিগরী নৈপুণ্য গেছে অনেকখানি কমে। তাই আজ আর

এই ঢাকাই কারিগরদের মত নিপুণ কারিগর বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন হয়েছে, হয়তো তারই ফলে এই জাতীয় নিপুণ কারিগরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে এবং তাঁরাও পিতৃ-পুরুষের পেশা ত্যাগ করে অন্য উপায়ে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করছেন। দুঃখের বিষয়, এই নির্মম সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

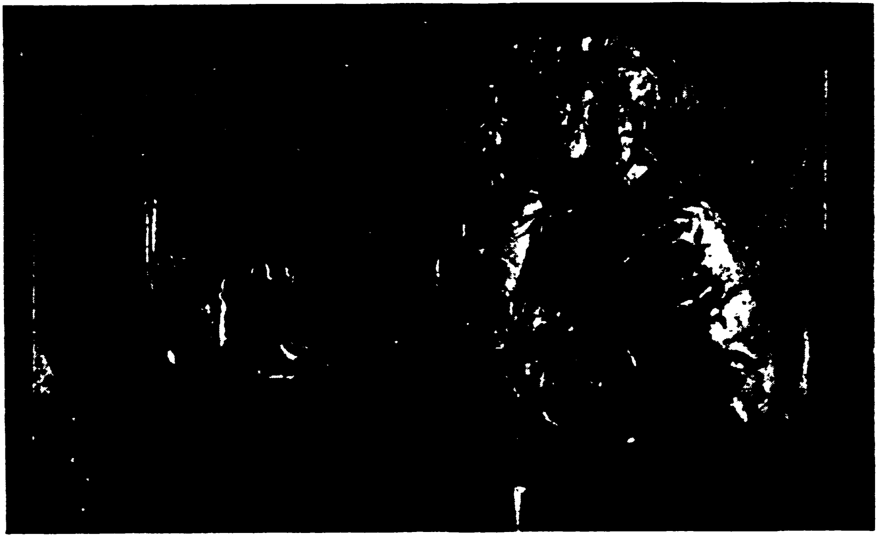
মঞ্চের পিছনে দেয়াল-গাত্রে আছে আচার্য নন্দলালের আঁকা একটি বিরাট চিত্র। পুরুষের হাতে নগ্ন তরবারি—সে এগিয়ে চলেছে নির্ভয়ে সত্যের সন্ধানে। প্রকৃত সত্য অনাবৃত, উন্মুক্ত বলে' তরবারিটিও খোলা।' পুরুষের আগে আগে চলেছে নারী—বাঁশী হাতে, কল্পনা ও প্রেরণা জোগাতে। নারীহস্তের এই মোহিনী বাঁশীই যুগ যুগ ধরে সত্যের সন্ধান-রত পুরুষকে দিয়ে আসছে উৎসাহ, প্রেরণা ও কল্পনা। এই দুটি মূর্তির পিছনে পড়ে আছে পদচিহ্ন, যা অনুসরণ করে সত্যের সন্ধানে এগিয়ে চলবে পরবর্তী যুগের মানুষেরা।

এই বক্তৃতাকক্ষটির মাপ ৭০´×৬০´। কাঠের মঞ্চ থেকে প্রথম শ্রেণীর বসবার আসন পর্যন্ত প্রায় ৩২´ পরিমিত স্থান অর্ধচন্দ্রাকারে ফাঁকা রাখা হয়েছে। এই ফাঁকা জায়গাটির উপরে ছাদ ঠিক রাখবার জন্যে সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাজারে বহু কষ্টে দু-খানি দু-ফুট চওড়া বিম যোগাড় করে লাগাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল যে, বিম মোটা হওয়ার দরুণ ছাদের মধ্যে একটা গর্তের মত সৃষ্টি হলো এবং তাতে

আশঙ্কা হলো যে, বক্তৃতাকালে হয়তো এই গর্তে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হবে। সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যে ছাদের নীচে অর্ধচন্দ্রাকারে শব্দনিরোধক 'সিলিং' (ceiling) দেওয়া হয়। এই সিলিং-এর জায়গাটিকে অজন্তা গুহাচিত্রের ধরণে আঁকা ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। ছাদে সেই সুন্দর চিত্র দেখে কেউ ভাবতে পারবে না যে, তার পিছনে শব্দনিরোধক ব্যবস্থা লুকানো আছে। এই সুন্দর চিত্রটির মাঝখানে আঁকা আছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, পরে বলয়াকারে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতীক পদ্মের মধ্যে বজ্র আঁকা আছে। তার পরবর্তী বলয়ে অঙ্কিত আছে আচার্যদেবের গবেষণার বিষয় বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতার পাতা। সর্বশেষ বলয় আঁকা হয়েছে পদ্মপাতা ও কুঁড়ি দিয়ে।

বক্তৃতাকক্ষের দোতলায় গ্যালারী [illegible] নীচে খানিকটা ফাঁকা থাকে। তাতে সন্দেহ হয় যে, বক্তৃতাকালে এই শূন্যস্থানে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়ে বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে! তাই গ্যালারীর নীচে একটি লম্বা ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরটি একটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে।

বক্তৃতাকক্ষের উপরের ছাদ ধরে রাখবার জন্যে আটটি স্তম্ভ আছে। সামনে চারটি ও পিছনে চারটি। এই স্তম্ভগুলি ইস্পাতের তৈরী। কড়িকাঠগুলি আছে ১৪ ফুট তফাতে। এর জন্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তা ভরাট করবার জন্যে রি-ইনফোর্সড টিউবুলার নির্মাণ করে ছাদের প্রয়োজন মেটাতে হয়েছিল। কলকাতার গৃহনির্মাণে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম।



ফ্রান্সে নির্মিত বাস-রিলিফ : বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারত আচার্যদেব

মোটামুটি ইস্পাতের স্তম্ভগুলি যাতে শ্রোতৃবৃন্দের দৃষ্টির ব্যাঘাত না ঘটায়, বক্তৃতাকক্ষ নির্মাণের সময় সেদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। শ্রোতৃবৃন্দের জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলির বিন্যাস এমন-ভাবে করা হয়েছে যে, এই সব স্তম্ভ কোন প্রকারেই তাঁদের দৃষ্টি ব্যাহত করে না। আলোচ্য বক্তৃতাকক্ষে ১,২০০ শ্রোতার ভাল-ভাবে বসবার ব্যবস্থা আছে। এঁদের সকলেরই বক্তৃতা শোনবার বা বক্তৃতামঞ্চে বক্তাকে কিংবা কোন প্রকার যান্ত্রিক পরীক্ষা দেখবার কোনও অসুবিধা হয় না।

বক্তৃতাকক্ষের পশ্চিমে একসারি ঘর নির্মাণ করা হয় এবং সেগুলি ব্যবহৃত হয় পরীক্ষাগার হিসেবে। তার পরে আছে লন এবং সর্বশেষে ছিল আমাদের উদ্ভিজ্জাগার (Herbarium)। বসু-বিজ্ঞান মন্দির নির্মিত হবার দু-চার বছর পর তৎকালীন বাংলার মুখ্যসচিব মিঃ পি. সি. লায়ন তাঁর অবসর গ্রহণের মুখে আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই দুর্ধর্ষ ইংরেজ সিভি-লিয়ানটি ছিলেন সে যুগের ত্রাসবিশেষ। তিনি কঠোর হস্তে স্বদেশী আন্দোলন দমন করেছিলেন। তিনি আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, তিনি নিজের চাকরির খাতিরে বাংলা-দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন। সে জন্যে তিনি অনুতপ্ত। তাই তিনি ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবার পূর্বে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কিছুটা উপকার করে আংশিকভাবে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার অভিপ্রায় জানান। সেই সময় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের লনের উত্তরদিকে প্রকাণ্ড একটি বস্তি ছিল। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র মিঃ লায়নকে বলেন যে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্প্রসারণের

জন্যে এই বস্তির জমিটা তাঁর প্রয়োজন এবং মিঃ লায়ন যদি এই জমিটা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে পাইয়ে দিতে পারেন, তাহলে খুব ভাল হয়। বাস্তবিক পক্ষে মিঃ লায়ন অবসর গ্রহণের আগেই আচার্যদেবের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি সরকারী খরচে বস্তির জমিটা অধিকার করে তাথেকে প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমি দান করে গিয়েছিলেন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে। এই সরকারী দানের ফলে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্প্রসারণ-কার্য সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এই বাড়তি জমিটা পাবার ফলে লনটি বড় করে তার একাংশে বাগান করা সম্ভব হয়। এই জমির সাহায্যে গত ৪০ বছরের মধ্যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে। সংস্কার ও পরিবর্তন যেমন হয়েছে, তেমনিই একাধিক নতুন গৃহনির্মাণও সম্ভব হয়েছে।

এ-কথা বলে রাখা ভাল যে, এসব সংস্কার, পরিবর্তন ও নতুন নির্মাণ, সবই করা হয়েছে আদি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মূল ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। জানি না, ভাবী যুগে যাঁদের হাতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ব্যবস্থাপনার ভার পড়বে, তাঁরা ভবিষ্যতে গৃহনির্মাণের ব্যাপারে স্থাপত্য শিল্পের এই সঙ্গতি বজায় রাখবেন কিনা! আমার জীবিতকালেই দেখতে পাচ্ছি, আজ স্থাপত্য শিল্প ধীরে ধীরে যে রূপ পরিগ্রহণ করছে, তাতে তার শিল্পের দিকটা প্রায় উহ্য হতেই চলেছে।

বর্তমান যুগের স্থপতিরা গৃহনির্মাণের ব্যাপারে শিল্পের চেয়ে প্রয়োজনের উপরেই জোর দেন বেশী। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গী আচার্যদেবের জীবনাদর্শের বিরোধী। আশা করি, ভবিষ্যতে

কোনদিন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের জীবনে এই দুর্দৈব দেখা দেবে না। আর নেহাৎই যদি কোন স্থপতি ভবিষ্যতে কোনদিন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাঙ্গণে অতি আধুনিক ধরণের কোন গৃহ নির্মাণ করেন, তাহলে তাঁকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাষাতেই আবার বলতে চাই, "যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

যত প্রয়োজনের তাগিদই থাকুক, আমাদের স্থাপত্য শিল্প যেন সৌন্দর্যবোধ-বিরহিত না হয়—আমি এই কামনাই করি।

বর্তমানে দক্ষিণ দিকে একসারি নতুন গৃহে রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। তার পরের অংশে দোতলায় পাঠাগার ও নীচে অধ্যক্ষের (Director) অফিস-কক্ষ ও আরও কিছু গবেষণাগার। পশ্চিমে আগে যেখানে ছিল উদ্ভিজ্জাগার, এখন সেখানে একতলায় করা হয়েছে কারখানা ও দোতলায় গবেষণাগার। উত্তরে একসারি ঘরে করা হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যার বিভাগ ও পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার। সুবিস্তীর্ণ লনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য মনকে সংযত করে ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে।

বিজ্ঞান-মন্দিরের এলাকার উত্তর-পূর্ব কোণে আছে ছোট একটি পাথরের মন্দির; তার সামনে আছে মর্মর পাথরের চত্বর। মন্দিরের মধ্যে আচার্যদেবের পিতামাতার দেহভস্ম সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই সঙ্গে পরে আচার্যদেবের ও তাঁর পত্নী

শ্রীযুক্তা অবলা বসুর দেহাবশেষও এই মন্দিরে সংরক্ষিত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বগৃহের রূপসজ্জার কথা উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জগদীশচন্দ্রের বাসগৃহটি ছিল বিলাতী ধরণে তৈরী। এই গৃহের রং লাল ছিল বলে পাড়ার অধিবাসীদের কাছে এটি "লালকুঠী" নামে পরিচিত ছিল। আমার উপর নতুন করে এই গৃহের রূপসজ্জার ভার পড়ায় আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছিলাম পরস্পর সংলগ্ন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের রূপসজ্জার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য বিধান করে একে ভারতীয় পদ্ধতিতে সাজিয়ে তুলতে। তাঁর নির্দেশে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের রূপসজ্জার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার কথা পূর্বেই বলেছি। এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তিনি আমাকে অনুরূপভাবে তাঁর নিজের বাসভবনটিও শিল্পকার্যের দ্বারা সজ্জিত করবার ভার দেন। এই বিজ্ঞান-সাধকের মনে যে একটি সুন্দরের পূজারী নীরবে বিদ্যমান ছিল, এই রুচিবোধ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর বাসগৃহের যে রূপসজ্জার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম, নীচে তার পরিচয় দিলাম।

আচার্যদেবের বাসগৃহে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ে কালো পাথরের তৈরী কৃত্রিম পাহাড় এবং নদী। সেই ছোট নদীর উপর পারাপারের জন্যে কাঠের একটি ছোট্ট সেতুও আছে। এই পাহাড় এবং নদী জগদীশচন্দ্রের একান্ত প্রিয় ছিল। এই দৃশ্য দেখলে মনে পড়ে যায় "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে"র লেখক সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্রকে। এই কৃত্রিম পাহাড় ও নদী তৈরি

করা হয়েছিল অজন্তা গুহা-মন্দিরের চিত্রের অনুসরণে। কৃত্রিম নদীটির ওপারে রয়েছে আচার্যদেব কর্তৃক সংগৃহীত একাধিক প্রাচীন মূর্তি। একটি—বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীতে প্রাপ্ত, সূর্য-দেবের মূর্তি—সম্ভাব্য নির্মাণকাল দশম থেকে একাদশ শতাব্দী, আর একটি শিরহীন মূর্তি আছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ-দেবের। এর সম্ভাব্য নির্মাণকাল একাদশ শতাব্দী।

বাসভবনের অভ্যন্তরে প্রথমেই তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানা। এখানে বসে তিনি দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। শিল্পকলার প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগের ছাপ এই বৈঠকখানাটিরও সর্বত্র সুপরিস্ফুট। বৈঠকখানার উত্তর দেয়ালে আছে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের আঁকা মাতৃমূর্তি বা ভারতজননীর চিত্র—তাঁর চার হাতে খাদ্য, বস্ত্র, বিদ্যা ও ধর্মের প্রতীক। ঘরটির চারদিকের ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থলে সেগুন কাঠের উপর আঁকা শিল্পী নন্দলালের মহাভারতের কাহিনী ও অজন্তা গুহাচিত্রের অনুসরণে বুদ্ধদেবের জীবনের কাহিনী। মহাভারতের কাহিনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে [illegible] জীবনের সেই চিরন্তন সমস্যা—জীবনের সংগ্রাম ও শান্তি। একদিকে দেখা যায় কুরুপাণ্ডবের দ্যূতক্রীড়ার [illegible] এক পাশে বাজি হিসাবে রাখা আছে রাজমুকুট, আর [illegible] যুদ্ধায়োজন এবং অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ [illegible]বের দৃশ্য—"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ।" দেয়ালের আর একদিকে দেখানো হয়েছে যুদ্ধশেষের অবস্থা—বিজয়ী পাণ্ডব ভ্রাতারা গালে হাত দিয়ে বিমর্ষভাবে বসে আছেন,

এক পাশে চলেছে বিজয়োৎসব, আর তারই পাশে শ্মশানের ভয়াবহ দৃশ্য, বিধবা নারীদের করুণ আর্তনাদের চিত্র। পশু-পাখীর চিত্রের মাধ্যমেও এই জীবন-সংগ্রামের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে—আছে ষাঁড়ের লড়াই, হাতীর লড়াই, পাখীদের প্রভাত-কূজন ও সন্ধ্যাবেলায় কুলায়ে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য। এক দিকে দেখানো হয়েছে, পাখীদের জলকেলিতে উদ্বেলিত একটি জলাশয়ের দৃশ্য এবং অপর দিকে রয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিপূর্ণ শান্ত জলাশয়ের একটি চিত্র। জীবনের সমস্ত সংগ্রামের শেষ কথা এই অখণ্ড শান্তি। শিল্পাচার্য নন্দলালের তুলিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শই যেন ফুটে উঠেছে তাঁর বৈঠকখানার দেয়ালের গায়ে।

এ-ছাড়াও বৈঠকখানার দেয়ালের গায়ে ঝোলানো আছে প্রসিদ্ধ শিল্পীদের আঁকা কয়েকখানি চিত্র। এই চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অবনীন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এবং গগনেন্দ্রনাথের আঁকা তিনখানি চিত্র। গগনেন্দ্র-নাথের চিত্রগুলির মধ্যে একটি হলো—মন্দিরের পথে তীর্থযাত্রী-দের যাত্রার দৃশ্য, একটিতে বালক জগদীশচন্দ্রকে গাছের ডাল হাতে ছুটাছুটি করতে দেখা যায় এবং অপরটিতে দেখা যায়, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে নিজের উদ্ভাবিত 'ক্রেস্কোগ্রাফ' (Crescograph) যন্ত্র নিয়ে কর্মরত।

বৈঠকখানায় জগদীশচন্দ্রের শিল্পানুরাগের নিদর্শন স্বরূপ আরও আছে—ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রদত্ত সুন্দর একটি পাটির কাজ। তার উপর মন্দির প্রভৃতির

দৃশ্য সুন্দরভাবে অঙ্কিত। সোনালী রঙে আঁকা একটি চৈনিক বা ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্তিও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালো রঙের দুটি হাতীর মূর্তির উপর একটি কাঠের বসবার আসনও গৃহস্বামীর সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়।

শ্রীযুক্তা অবলা বসুর লেখার ঘরে রক্ষিত আছে, শিল্পী অতুল বসুর আঁকা জগদীশচন্দ্রের একটি বড় তৈলচিত্র। বারান্দায় যেখানে জগদীশচন্দ্রের চা-পানের আসর বসতো, সেখানে রাখা আছে বহু রকমের বুদ্ধমূর্তি—ধ্যানী বুদ্ধ, উপবিষ্ট বুদ্ধ, গান্ধার স্কুলের বুদ্ধ প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে মোগল ও রাজপুত যুগের বহু চিত্র। ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের কি গভীর অনুরাগ ছিল, তারই নিঃসংশয় প্রমাণ।

৭

বর্তমানে ভারতবর্ষে যতগুলি বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আছে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির যে তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, এ-কথা বোধ হয় বলবার অপেক্ষা রাখে না। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ছাত্রছাত্রী ভারতের বহু বিজ্ঞানাগারে এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থায় নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণকল্পে আচার্যদেব অনুরাগী ভক্তবৃন্দের নিকট থেকে অনেক অযাচিত দান পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পৌনঃপুনিক ব্যয়নির্বাহের জন্যে নিজের সঞ্চিত এক লক্ষ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে দান করে যান। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের প্রাথমিক সমস্ত ব্যয়ভারও বহন করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। এই ব্যাপারে লেডি অবলা বসুও ছিলেন তাঁর প্রকৃত সহধর্মিণী। এই মহীয়সী মহিলার ঐকান্তিক সাহায্য, সমর্থন ও সাহচর্য না পেলে আচার্যদেবের পক্ষে তাঁর নিজের জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য হতো। এই বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল বলে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের সর্বপ্রকার ব্যয়সঙ্কোচ করে পূর্বাপর অর্থসংগ্রহ করতেন। যে যুগে পাশ্চাত্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই সাহেবী কেতায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই যুগে

.য আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রথমে এণ্টালী ও পরে আপার সার্কুলার রোড এলাকায় বসবাস ক'রে গেছেন, তা নিরর্থক নয়। এক দিকে স্বদেশী জীবনধারার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অপর দিকে ব্যয়সঙ্কোচের স্পৃহা যে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

যা . . বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারী . সরকারী নানা সূত্রের নানাবিধ দানে এই . . প্রতিষ্ঠানটি . . হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানাচার্য এই বিজ্ঞান-মন্দি . . . . উৎসর্গ করেছিলেন এবং সুখের বিষয়, মায়ের কৃপায় এই প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতিতে অর্থ বা জনসমর্থনের অভাব এ-পর্যন্ত ঘটে নি। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবার পর . . . . . . সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক সাহায্য . . . দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের . . . . গণকে ছয়টি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বৃত্তি ছয়টির . . . . টি ছিল মাসিক দুইশত টাকার ও তিনটি . . . সিক দেড়শত টাকার। এর কিছুকাল পরে আচার্য জগদী . . . বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উন্নয়নকল্পে বোম্বাই-এর ধনী ব্যবসায়ী . . নজীব কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দান . . . পান। এই সময়ে অন্যান্য যাঁরা আর্থিক সাহায্য . . বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে সার্থক করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ . . . হলেন—বরোদার গাইকোয়াড়, দানবীর মহারাজা মণীন্দ্র . . নন্দী, ওয়ার্ধার যমুনালাল বাজাজ, মূলরাজ খাটাউ প্রভৃতি। এই সময়ে বোমানজী-ই উদ্যোগী হয়ে

বোম্বাইতে আচার্যের বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বক্তৃতার হলে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রতিদিন টিকিটের হার ধার্য করা হয়েছিল একশত টাকা ও পঞ্চাশ টাকা। তবুও এত শ্রোতার সমাবেশ হয়েছিল যে, হলে স্থান দেবার উপায় ছিল না। তাই আচার্যদেবকে বোম্বাইতে তিনদিন বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। এই বক্তৃতাগুলির টিকিট বিক্রয়লব্ধ প্রায় ৫০ হাজার টাকাও জগদীশচন্দ্র তাঁর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উন্নয়নকল্পে দান করেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন আমার উপর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের নির্মাণকার্যের ভার দেন, তখন আমি নিজের জীবিকার জন্যে একটি বিস্কুট কারখানায় কাজ করতাম। আমি সেই কারখানার কাজের সঙ্গে এই গুরু দায়িত্ব সাধ্যানুসারে বহন করেছি। যাহোক, আমার প্রায় দু-বছরের চেষ্টায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়। সেই সময় ঐ বিস্কুট কারখানায় আমার চাকুরির তিন বছরের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। তখন আচার্যদেব আমাকে চাকুরির আর নতুন চুক্তি করতে নিষেধ করেন এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ব্যবস্থাপনার জন্যে আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের অধীক্ষক বা Superintendent হিসাবে দু-শ' টাকা মাসিক বেতনে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। বলা বাহুল্য, আমি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হই। তদবধি আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন আছে। আমি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মী হিসাবে যোগ দেবার পর আচার্যদেব সর্বপ্রথম এই

বিজ্ঞান-মন্দিরের যে পরিচালক পর্ষদ্ বা Governing Body গঠন করেন, তার সদস্য নির্বাচিত হন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার নীলরতন সরকার, ডাঃ বি. এল. চৌধুরী, শ্রীসুধাংশুমোহন বসু, শ্রীযুক্তা অবলা বসু ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আমাকেও পরিচালক পর্ষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। পরিচালক পর্ষদের প্রথম কাজ হয়, নানাভাবে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে কি ভাবে সমস্ত ব্যয়ভার মিটিয়ে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের একটি রিজার্ভ ফাণ্ড বা সংরক্ষিত ধনভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। পরিচালক পর্ষদের প্রথম সভার পর হিসেব করে দেখা যায় যে, সর্বপ্রকার ব্যয়ভার মিটিয়েও প্রায় দু-লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। সেই উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে সংরক্ষিত ধনভাণ্ডার খোলা হয়। ভারতে বৃটিশ সরকার প্রথমে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিচালনার জন্যে বার্ষিক সামান্য অনুদান দিতেন। ক্রমে এই বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ বেড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা, পরে এক লক্ষ টাকা হয়। ভারত স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকারের কাছ থেকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির যে অনুদান পায়, তার বার্ষিক পরিমাণ হল সাড়ে আট লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা আবর্ত্তক অনুদান ও আড়াই লক্ষ টাকা অনাবর্ত্তক অনুদান। আমাদের নিজস্ব সংরক্ষিত ধনভাণ্ডারে দু-লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ষোল লক্ষ টাকা হয়েছে।

আর্থিক বনিয়াদ কিছুটা দৃঢ় হবার পর বসু-বিজ্ঞান-মন্দির তার শাখা-প্রশাখাও ছড়িয়েছে। মূল বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পরে দার্জিলিঙে “অ্যাবে হোম” ও “স্যাংটাম”

নামে ছুটি বাড়ি কিনে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অঙ্গ হিসেবে একটি গবেষণাগার সেখানে গড়ে তোলা হয়। এই গবেষণাগার স্থাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—সমতল ভূমি থেকে বহু ঊর্ধ্বের গাছগাছড়া সম্বন্ধে গবেষণা করা। বর্তমানে দার্জিলিঙের ঐ গৃহ ছুটির সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। সেই ছুটি বাড়িতে "মায়াপুরী" ও "হৈমবতী" নামক গবেষণাগারের কাজ চলছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের দিকে কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ২৪-পরগণা জেলার ফলতায় সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত বাতিঘরে পরিচালকের (Director) জন্যে বাংলো ও পরীক্ষার জন্যে বাগান সৃষ্টি করা হয়। এই বাতিঘরটি সরকার বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরকে দান করেছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে ২৪-পরগণা জেলারই শ্যামনগর নামক স্থানে ৪৫ বিঘা জমি নিয়ে তৈলবীজ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার জন্যে অপর একটি গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এখানে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। মূল বিজ্ঞান-মন্দির ছাড়াও উল্লিখিত চারটি গবেষণাগারে বর্তমানে পূর্ণোদ্যমে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজ চলছে। এ-ছাড়া ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নতুনভাবে এই বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারাকে প্রসারিত করবার ব্রত গ্রহণ করা হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক ভাণ্ডারে প্রায় ছু-লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে এবং সেই উদ্বৃত্ত অর্থের সুদে এ-পর্যন্ত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রায় পাঁচ-সাতটি জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে

কৃতী ভারতীয় ও বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ এই বক্তৃতামালায় অংশ গ্রহণ করেছেন। জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক হিসাবে ১৫০ বিঘা জমি নিয়ে আর একটি বড় গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়াসও চলেছে। এই গবেষণাগারে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য গবেষণা বৃহত্তর ভিত্তিতে করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আচার্যদেবের সহধর্মিণী লেডি অবলা বসুর কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সর্বক্ষণ স্বামী’ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি আচার্যদেবের সাধনাকে নানাভাবে সার্থক করে তুলেছিলেন। আচার্যদেব তাঁর কর্মক্ষেত্রে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যে অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, সহধর্মিণী হিসাবে এই মহীয়সী মহিলার সহায়তা না পেলে এরূপ সর্বাঙ্গীণ সাফল্য-লাভ সম্ভব হতো কি না, সন্দেহ। আচার্যদেব নিজেও এ-সম্বন্ধে বলেছেন—“আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি…‘হইতে পারে না’ বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব।… আর একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে।”

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকবার সময় ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে জগদীশচন্দ্র এই মহীয়সী মহিলার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তখনকার দিনে

দুর্গামোহন দাশ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামজাদা অ্যাডভোকেট। দেশের প্রগতিমূলক কর্ম-প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন জগদীশচন্দ্রের পিতৃদেব ভগবানচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। শ্রীমতী অবলা দাশ তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ রায় অবলা দাশের দুই সহোদরাকে বিবাহ করেন। দেশের আর্থিক উন্নয়ন ও শিল্প-সংগঠনের কাজে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে দুর্গামোহন দাশ ও ভগবানচন্দ্র বসুর মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। জগদীশচন্দ্র ও অবলা দাশের বিবাহবন্ধন তার সার্থক ও শুভ পরিণতি।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবলা দাশ তখন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছিলেন। পিতার স্বদেশপ্রেম ও জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই মহীয়সী মহিলা পরবর্তীকালে নানাবিধ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জগদীশ-চন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণীর ভাবধারার মধ্যে অপূর্ব সঙ্গতি তাঁদের জীবনকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। গবেষণা ও প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্রকে বহুবার বিদেশভ্রমণ করতে হয়েছে। এই বিদেশভ্রমণেও লেডি বোস স্বামীর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকেন নি।

প্রথম জীবনে অবলা বসুর গৃহস্থালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না। নবদম্পতিকে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্যে শিক্ষা নিতে হবে—এই উদ্দেশ্যে দুর্গামোহন দাশের নির্দেশমত



স্মৃতি মন্দির : এখানে আচার্যদেবের পিতা মাতা ও সহধর্মিণীর
চিতাভস্ম রক্ষিত আছে

অভিভাবকদের কাছ থেকে দূরে নববধূকে নিয়ে জগদীশচন্দ্র চন্দননগরে গঙ্গার ধারে মাস কয়েকের জন্যে বাস করেছিলেন। গঙ্গার অপর পাড়ে নৈহাটি। বসুপত্নী রোজ নৌকায় করে জগদীশচন্দ্রকে নৈহাটিতে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। সেখান থেকে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতেন। বিকেলের দিকে আবার স্বামীকে নিয়ে যাবার জন্যে নৌকা নিয়ে নৈহাটিতে অপেক্ষা করতেন। গৃহস্থালীর ব্যাপারে এভাবে তিনি ক্রমশঃ সুনিপুণ গৃহিণী হয়ে ওঠেন। গৃহকর্মে নৈপুণ্য, বিশেষ করে তাঁর রন্ধনপটুতার বিষয় রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে সকৌতুক উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি যে কেবল আচার্যদেবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সাংসারিক ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকতেন, তা নয়—সমাজকল্যাণে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের অসহায়া বিধবা এবং সমগ্রভাবে নারীজাতিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারী-শিক্ষা সমিতি গঠন করে গ্রামাঞ্চলের বহু পল্লীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া মেয়েদের জন্যে তিনি 'কো-অপারেটিভ হোম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সেটি এখন 'উদয়ভিলা উইমেন্‌স্ কো-অপারেটিভ হোম' নামে পরিচিত। বিধবাদের জন্যে ঝাড়গ্রামেও 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' নামে আর একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অর্থসাহায্যে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। চা-বাগানের শেয়ারের তাঁর তিন ভগ্নীর

অংশের প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি এই শিক্ষালয়ের সম্মুখে দুর্গামোহন ভবনটি নির্মাণ করিয়ে দেন। আজীবন তিনি এই শিক্ষালয়ের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আমাদের দেশের মেয়েদের, বিশেষ করে অসহায়া বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশার কথায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠতেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের দুঃখমোচনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন।

এই 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' এবং মেয়েদের 'কো-অপারেটিভ হোম,' আমার যতদূর জানা আছে, তাতে বোধ হয়, ভারতে এ-দুটিই ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা।

১৯৩৭ সালে আচার্যদেবের তিরোধানের পর এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে এসে যোগ দেন আচার্যদেবের ভাগিনেয়, কৃতী বিজ্ঞানসাধক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু। তিনিও আচার্য জগদীশচন্দ্রের অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগদানের পূর্বে তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের "পালিত অধ্যাপক"। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের কর্মাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট। তাঁরই সুযোগ্য পরিচালনায় এই বিজ্ঞান-মন্দির উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয়ে চলছে। আচার্যদেবের জীবিতকালে এবং তিরোধানের পর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সুসজ্জিত বক্তৃতাকক্ষে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দিবসে ৩০শে নভেম্বর (এই তারিখটি আচার্যদেবের জন্মদিবসও বটে) বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।

আচার্যদেব দেহত্যাগের সময় কোন উইল রেখে যেতে পারেন নি। তবে তাঁর মনোগত অভিপ্রায়গুলি তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই আমাকে বলেছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের টাকার নিম্নোক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করা হয়েছে :—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা, বঙ্গ-বিহার মৈত্রীস্থাপন ও মাদক নিবারণের জন্যে ১ লক্ষ টাকা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্যে বিদ্যাসাগর বাণীভবনকে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী ও ব্রাহ্মসমাজকে। আচার্য জগদীশচন্দ্র কিরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সহজ সরল জীবন যাপন করতেন, তা তাঁর এই ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখলে কিছুটা বোঝা যায়।

মানুষ গড়ে তোলবার যে আদর্শ প্রতিনিয়ত আচার্যদেবের চরিত্রে রূপায়িত হতে দেখেছি, তার ধারা যাতে অব্যাহত থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থা করবার জন্যে দুটি অস্থি ভাণ্ডারও গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ১ লক্ষ টাকা ও বঙ্গ-বিহার মৈত্রীর ১ লক্ষ টাকা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ২নং জগদীশচন্দ্র অস্থি ভাণ্ডার। ১নং অস্থি ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে। আচার্যদেবের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের দান ও তাঁর নিজের সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে এই ১নং অস্থি ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল। তাঁর অবর্তমানে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিচালনায় আর্থিক অসুবিধা যাতে না হয়, সে জন্যেই তিনি অস্থি ভাণ্ডার সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। বসু-

বিজ্ঞান-মন্দির পরিচালনার জন্যে যে সরকারী অনুদান ও অর্থসাহায্য পাওয়া যায়, তা যদি কোনদিন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই প্রতিষ্ঠান অর্থ-সঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারে, এরূপ একটা আশঙ্কা হয়তো তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানটিকে পুরাপুরি স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে। তাঁর সেই অভিপ্রায়ের ফলই হলো ১নং অছি ভাণ্ডার। বর্তমানে এই ১নং অছি ভাণ্ডারে অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। আমি এই অছি ভাণ্ডারের পরিচালক কমিটিরও সদস্যরূপে জড়িত আছি।

২নং জগদীশচন্দ্র অছি ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন আচার্যদেবের পত্নী লেডি অবলা বসু, স্বামীর ইচ্ছানুসারে। ২ লক্ষ টাকা নিয়ে এই অছি ভাণ্ডারের কাজ সুরু হয়েছিল। ১নং অছি ভাণ্ডারের অর্থের সুদ থেকে যে টাকা পাওয়া যায়, তার সাহায্যে বিজ্ঞানের উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বিদেশে অধ্যয়নের জন্যে বৃত্তি দেওয়া হয়। জ্ঞানবীর ও কর্মবীর আচার্য জগদীশচন্দ্র দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে নিজে যে কর্মধারার সূচনা করেছিলেন, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ও আমি তাকে এইভাবে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছি। এই কাজে আমরা ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সকল কর্মীর কাছ থেকে। দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি থেকেও আমরা বঞ্চিত হই নি। এভাবেই আমরা জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার নিরলস প্রয়াস করেছি।